সহিষ্ণু সময়

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

কোন্ অপশক্তির টার্গেট ব্রিটিশ কূটনীতিক

দেশের উগ্রপন্থীরা যে কতটা দুঃসাহসী, কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, অল্প সময়ের ব্যবধানে তার তিনটি প্রমাণ আমরা দেখলাম। নিকট অতীতে রয়েছে একগুচ্ছ ঘটনা, যা ওই দিকেই ইঙ্গিত করে। গ্রামের গির্জায় প্রার্থনাসভায়, সিনেমা হলে, উদীচীর সঙ্গীত অনুষ্ঠানে, ছায়ানটের নববর্ষ পালন, যা প্রতিবছর হয়ে আসছে রমনার বটমূলে, সেই অনুষ্ঠানে বোমা ফাটিয়ে যারা ধরা পড়েনি, তারা সাহসী না হলে কারা হবে? এর মধ্যে তিনটি ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, তাদের দুঃসাহস অতীতের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এক. তারা টঙ্গীর জনসভায় ব্রাশফায়ারে হত্যা করেছে সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টারের মতো একজন জনদরদী ও জনপ্রিয় নেতাকে; দুই. তারা 'বাংলা ভাই'-এর সশস্ত্র ক্যাডার, পুলিশ পাহারায় রাজশাহী শহর দাপিয়ে বেড়িয়েছে। সর্বহারা দমনের নামে তাদের নিজেদের খুন ও অন্যান্য জঘন্য অপরাধের জন্য বিন্দুমাত্র শঙ্কাবোধ না-করে, এবং তিন. তাদেরই একজন বা কয়েকজন সিলেটে হজরত শাহজালালের দরগায় জুমার নামাজের অব্যবহিত পর ওই নামাজে যোগদানকারী ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে লক্ষ্য করে বোমা বা গ্রেনেড ছুড়ে আহত করেছে তাঁকে ও জেলা প্রশাসককে। হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী সিলেটেরই সন্তান। ব্রিটিশ নাগরিক, ব্রিটিশ কূটনীতিক হয়েও তিনি ভোলেননি তাঁর জন্মস্থান সিলেটকে। সিলেটে তাঁর কোন শত্রু থাকার কথা নয়। সিলেটবাসীর উষ্ণ সংবর্ধনা অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা বা গ্রেনেড ছুড়তে পারে কে, কারা ও কী কারণে? এটাই প্রশ্ন। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা নাকি বলেছেন, সম্প্রতি যতগুলি বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে, সবগুলি একই প্রকৃতির। এ থেকে আন্দাজ করা যায়, যারা এ সব ঘটনা ঘটাচ্ছে, তারাও সমভাবাপন্ন, অভিন্ন দলভুক্ত না হলেও।

হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর গায়ে লেগেছিল বোমাটি, তবে ভাগ্যক্রমে ফাটেনি। গড়িয়ে গিয়ে একটু দূরে ফেটেছে। তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বেশ কয়েকজন। আনোয়ার চৌধুরী সিএমএইচ-এ চিকিৎসা গ্রহণ করে ইতোমধ্যে ব্রিটেনে চলে গেছেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে তিনজন পুলিশ কর্মকর্তা ঢাকায় পৌঁছে গেছেন সরজমিনে তদন্ত করতে। আরও দু'জন এসে যোগ দেবেন এই তদন্ত কাজে। ঘটনার বয়ান এ পর্যন্তই। এরপর আসছে ঘটনার তাৎপর্য। সেটাই আজকের প্রসঙ্গ। একটির পর একটি আক্রমণ সৃষ্টি করেছে এক ভয়ঙ্কর ধারাবাহিকতা। আক্রমণের প্রকৃতি, আক্রান্তদের পরিচয়, যে-অনুষ্ঠানে বা সমাবেশে আক্রমণ তার চরিত্র, সব কিছু একত্র করলে কি এই হিংসাত্মক ঘটনাগুলির মধ্যে একটা প্যাটার্ন চোখে পড়ে না? সেই প্যাটার্নেরই অন্য এক মাত্রা হলো, অপরাধীকে শনাক্ত করতে ও পাকড়াও করতে পুলিশের ব্যতিক্রমহীন ব্যর্থতা, ক্ষেত্রবিশেষে পুলিশ যদিবা পারছে, তবু শেষাবধি পারছে না উর্ধতর বা উর্ধতন মহলের রাস টেনে ধরায়। একই সঙ্গে দেখা যায় সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনার দায়িত্ব রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা। তদন্ত শুরু না হতেই দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সরকারের অনায়াস পটুত্ব নিয়ে অনেকেই কৌতুক বোধ করছে, কিন্তু সরকারের এই খাসলত বদলাচ্ছে না।

পুলিশের ব্যর্থতা, সরকারের ব্যর্থতাকে সহজভাবে নিতে পারছে না দেশের মানুষ। অবশ্য দেশের মানুষ কী ভাবছে, তা নিয়ে সরকার আদৌ চিন্তিত বলে মনে হয় না। তবে সর্বশেষ ঘটনায়, সিলেটে হজরত শাহজালালের দরগায় বাংলাদেশে ব্রিটিশ কূটনীতিক, হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর প্রাণনাশের চেষ্টাকে এভাবে ঢাকা দিয়ে পার পাবে না সরকার, সেটা সহজবোধ্য। কিছু দিন আগে চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসম্ভার, যা বেআইনীভাবে অথচ মনে হয় পুলিশের জ্ঞাতসারে পাচার করা হচ্ছিল, ধরা পড়ার ঘটনাটিকে যথারীতি ঢাকবার বা তদন্তকে ভিন্নপথে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছিল সরকার। কিন্তু বাদ সেধেছে আমেরিকা। আমেরিকা বাংলাদেশে অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র আমদানিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ও প্রকৃত তদন্তে সরকারের অক্ষমতা বা অনীহা লক্ষ্য করে এ ব্যাপারে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে। সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেনি সরকার তবে গ্রহণও করেনি। বলেছে, দরকার হলে আমরা আমেরিকার প্রস্তাবে সাড়া দেব। অন্য কথায় সরকার চায় না আমেরিকা এ ব্যাপারে নাক গলাক। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। সিলেটের ঘটনায় সরকার ব্রিটিশ পুলিশের আগমনে ও তদন্তে বাধা দিতে পারেনি। যেহেতু পুরো ঘটনাটি সরকারের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর এবং যেহেতু এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার এটাই করে থাকে বলে জানিয়েছেন লন্ডনে আমাদের হাইকমিশনার মোফাজ্জল করীম। সুতরাং এই একটি ক্ষেত্রে অপরাধ তদন্তে একটি বিদেশী দল এ দেশে কাজ করার সুযোগ লাভ করল। সরকার অস্বস্তি বোধ করলেও আপত্তি করতে পারছে না। ঝানু সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেছেন, সরকারের উচিত হবে সিলেটের ঘটনার তদন্ত করতে ব্রিটিশ পুলিশকে সম্মতি ও সহায়তাদান। অবশ্য শুধু মাত্র ওরাই নয়, আমাদের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাও একযোগে এই হত্যা প্রচেষ্টার রহস্য উদঘাটনে কাজ করবে। যেহেতু সন্দেহ করার কারণ আছে যে সাম্প্রতিক সকল বোমাবাজির ঘটনা একসূত্রে গাঁথা, অপরাধীচক্র একটাই, কিংবা পৃথক হলেও লক্ষ্যের দিক দিয়ে অভিন্ন, অতএব সিলেটের ঘটনার রহস্য উন্মোচন হলে একই ধরনের একাধিক ঘটনার রহস্যও উদঘাটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

অকুস্থলে, হজরত শাহজালালের দরগায়, এর আগে জানুয়ারি মাসে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, প্রাণহানি ঘটেছিল, অপরাধী ধরা পড়েনি। দরগায় অনেকগুলি কাছিম, যাদের বয়স হিসাবের বাইরে, মারা পড়েছিল, পানিতে বিষ দিয়ে কে বা কারা এই নিরীহ প্রাণীদের মৃত্যু কামনা করায়। ক'দিন আগে, ডেইলী স্টারের সংবাদ মোতাবেক (মে ২৫.০৪) জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী মাজার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। স্বভাবতই তদন্তে মাজার-বিরোধী যে সকল দল সক্রিয় রয়েছে তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করা হচ্ছে। কিছু সংখ্যক মাদরাসার উপরও নজরদারি চলছে। তদন্তে যে ৪টি উগ্রপন্থী ধর্মীয় দলের নাম এসেছে তারা হচ্ছে হরকাতুল জিহাদ, হিজবুত তওহিদ, হিজবুত তাহির ও সাহাবা সৈনিক পরিষদ। তদন্তের স্বার্থে আরও ৩টি দলের নাম উহ্য রয়েছে (ডেইলী স্টার, ২৫.৫.০৪)। প্রসঙ্গত, অনেকের মনে পড়বে, অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণের পূর্বেও জনাব সাঈদী তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কথা বলেছিলেন ও সংসদে ব্ল্যাসফেমী আইন প্রবর্তনের দাবি জানিয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে। এই আইনে 'ঈশ্বর নিন্দা বা ধর্মমতের প্রতি তীব্র কটাক্ষপূর্ণ' উক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। ঘটনাপ্রবাহ যে দিকে চলছে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকলে অচিরেই তাঁর বাসনা পূরণ হয়ে যেতে পারে। সফরকারী আমেরিকান মন্ত্রী আমাদের একজন মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আহমদিয়াদের ওপর এই নির্যাতন কেন। ওদের সব বই নিষিদ্ধ করার কারণ কি, মন্ত্রী অবলীলায় উত্তর দিলেন, ওরা ইসলাম ধর্মের বিকৃতি করছে। প্রশ্নকর্ত্রী ঠিকই বুঝে নিলেন, কোন্ দেশে তিনি এসেছেন, আর সে-দেশের সরকারের চরিত্র কি।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে হত্যার চেষ্টার পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, এ বিষয়ে বেশ জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ইরাকে ব্রিটিশ ভূমিকায় ক্ষুব্ধ কোন উগ্রপন্থী ব্যক্তি বা দল এভাবে তার ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাতে পারে। হত্যার 'প্রেরণা' হিসাবে এটা একটা চিন্তা। চট্টগ্রামেও মাজারের পানিতে বিষ ঢেলে একইভাবে জলের প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে। এ থেকে মনে হতে পারে, দুটিই মাজার-বিরোধী মতবাদের সহিংস প্রকাশ। তবে হজরত শাহজালালের মাজারে নিক্ষিপ্ত বোমা বা গ্রেনেডের লক্ষ্য যখন একজন কূটনীতিক, তখন 'প্রেরণা'র চরিত্র আর নিছক ধর্মীয় থাকে না, রাজনৈতিক হয়ে পড়ে। আমার ধারণা, তদন্ত সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছে। এদেশে কোন তদন্তই শেষ হয়নি বা ফলপ্রসূ হয়নি। এক্ষেত্রে যদি হয়, তাহলে তা হবে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। চট্টগ্রামে অস্ত্র পাচারের তদন্তে মার্কিনী সহযোগিতার প্রস্তাব। বলা যায়, সরকার অগ্রাহ্যই করেছে, কারণ এত দিনেও সে প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি সরকার। সিলেটের ঘটনায় আশা করি ব্রিটিশ পুলিশের অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করা হবে না, কারণ এর সুষ্ঠু তদন্তের ওপর দেশের ও সরকারের 'ভাবমূর্তি' নির্ভর করছে। 'ভাবমূর্তি' নিয়ে সরকার খুবই চিন্তিত। সরকারের দৃঢ়-ধারণা, বিরোধী দল প্রতিহিংসার বশে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার কাজে উঠে-পড়ে লেগেছে। সিলেটের মাজারের ঘটনায়ও যে এদের হাত আছে সে বিষয়ে দেখা গেল জামায়াত নেতাও একেবারে নিঃসন্দেহ। আমি ভাবছি, সিলেটের মানুষদের কথা– এরা দারুণভাবে আশাহত হয়েছে এই বোমাটির ঘটনায়। আমি ভাবছি হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর কথা। তিনি এখন লন্ডনে। আমি এ ঘটনায় তাঁর লজ্জা ও হতাশার কথা ভাবছি। তিনি যে-দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন ও যে-দেশে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, সেদেশের জন্য ভাল কিছু করার পরিকল্পনা তাঁর এভাবে শুরুতেই হোঁচট খাবে, তিনি নিশ্চয়ই ভাবেননি। কী বলবেন তিনি এদেশের স্বার্থে, এ দেশের জন্য ব্রিটিশ সাহায্য-সহযোগিতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়ার যুক্তি হিসাবে? জনাব চৌধুরীকে পরামর্শ দেবার যোগ্যতা আমার নেই, তবে তাঁকে আমার সহানুভূতি জানাতে পারি। বলতে পারি, দেখুন, এ দেশেই, এই নরকেই আমরা বাস করি। আপনি আমাদের হয়েও বাইরের লোক। আপনার কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের সকল অপরাধ 'নিজগুণে' মাফ করে দেবেন। আর হতাশ হবেন না, ফিরে যাবেন না। আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমাদের বাঁচতে হবে, সেই পথের সন্ধানই আমরা করছি; আপনি শীঘ্র সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন আমাদের মধ্যে।

বাদশার ঝুলন্ত লাশ, নিজামীর মিথ্যাচার এবং জামায়াতের 'বাংলা ভাই' কানেকশন

শাহরিয়ার কবির

বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের স্বঘোষিত জঙ্গী মৌলবাদী তথাকথিত বাংলা ভাইয়ের নৃশংসতার আলোকচিত্রিক দলিল গত ২১ মে (২০০৪) দেশের অধিকাংশ জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। এই দলিলটি নওগাঁ জেলার রানীনগরের অধিবাসী আবদুল কাইয়ুম বাদশার (৫২) গাছের ডালে ঝুলন্ত লাশের ছবি। বলা হয়েছে, বাদশা সর্বহারা পার্টি করতেন। এ কারণে সর্বহারা দমনের জেহাদে অবতীর্ণ বাংলা ভাইয়ের 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' তাঁকে হত্যা করে লাশের পায়ে দড়ি বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল মৌলবাদবিরোধীদের হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্য। এ ধরনের ছবি আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখত কিংবা দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে নিচে আগুন ধরিয়ে দিত কিংবা গরুর চামড়া ছাড়ানোর ছুরি দিয়ে তাদের চামড়া ছাড়িয়ে নিত। এ ধরনের ছবি দ্বিতীয়বার আমরা দেখি তালেবানী আফগানিস্তানে। আফগানিস্তানের কমিউনিস্টপন্থী প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহকে হত্যা করে এভাবে তাঁর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের এটা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যে, মোল্লা উমরের তালেবানরা কী করতে পারে। আট বছর পর বাংলাদেশের তালেবানপন্থী জোট সরকারের জমানায় আমরা আবার একই ধরনের লাশের ছবি কাগজে দেখলাম, যা কিনা মৌলবাদী নৃশংসতারই মূর্ত প্রকাশ। বাদশার ঝুলন্ত লাশের ভয়ঙ্কর ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার তিন দিন পর দৈনিক জনকণ্ঠে 'আরও অসংখ্য গাছে অসংখ্য লাশ ঝুলে থাকার আগেই কিছু করুন' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছে। এই প্রতিবেদনে রানীনগরের ভুক্তভোগী এক প্রবীণ শিক্ষকের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে। শফিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহমুদ মুসার লেখা এই চিঠির ভাষ্য নিম্নরূপ।

'উত্তর জনপদের নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার শফিকপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আমি। বাড়িও আমার একই গ্রামে। পৈতৃক ভূমিতে দেড় দশক আগে তিল তিল করে আমাদের পরিবার, গ্রামবাসী, জেলার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দের সর্বাত্মক সহায়তায় স্কুলটি গড়ে তুলেছি এবং এলাকার শিক্ষাবিস্তারে যৎসামান্য উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছি। আমার দীর্ঘদিনের পুরনো পৈতৃক বাড়িটির চারটি ঘরই গত ৮ মে তথাকথিত বাংলা ভাই-এর জেএমবি ক্যাডার বাহিনী ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। ঘটনাটি গত ১৬ মে'র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। একই

দিনে আরও এক প্রধান শিক্ষক ও নির্বাচিত চেয়ারম্যানের বাড়িসহ প্রায় ৭০টি বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছি। বাস্তুভিটা ধ্বংস ও গ্রাম ত্যাগের বেদনা মুছে যেতে না যেতেই আমার বড় ভাইকে (আব্দুল কাইয়ুম বাদশা) জেএমবির ক্যাডাররা গত ১৯ মে বুধবার উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরদিন আত্রাই ও রানীনগরের সর্বত্র মাইকিং করে ঘোষণা দিয়ে হত্যা করে পার্শ্ববর্তী বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার বামন গ্রামে রাস্তার এক গাছে ঝুলিয়ে রাখে। খবরের কাগজের পাঠকরা সে ছবিও গত ২১ মে পত্রিকায় দেখেছেন। শুনেছি, এই জল্লাদবাহিনী আমাকেও খোঁজাখুঁজি করছে। নাগালে পেলে হয়ত একই বর্বর পদ্ধতিতে হত্যা করে লাশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে। আমার পরিবারের অন্যদেরও জীবননাশের হুমকির কথা অহরহ শুনছি। আমার আরেক ভাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখনও গ্রামেই রয়ে গেছেন। কারণ এখন ফসলের মৌসুম। ইতোমধ্যে তাঁকেও একবার ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং কথিত ক্যাম্পে রেখে মানসিক নির্যাতনের পর ছেড়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আমাদের পরিবারটির একটি ঐতিহ্যগত অবস্থান আছে। আমাদের পরিবারের রয়েছে প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ও সংস্কৃতিমনস্কতার ঐতিহ্য। আমার দাদা ও বাবা দু'জনেই লেখালেখি ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমরাও সেই ধারাটিকে যথাসম্ভব রক্ষা করার চেষ্টা করছি। সম্ভবত সেটিই আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের অপরাধ।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের একটি সরকার আছে। প্রশাসন আছে। পুলিশ বাহিনী ও সেনাবাহিনী আছে। এলাকা থেকে নির্বাচিত এমপি প্রতিমন্ত্রী আছেন। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন। দেশে অসংখ্য মানবাধিকার সংগঠন আছে। সিভিল সোসাইটি আছে। সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দল আছে। এঁদের সকলের দায়িত্ববোধ ও বিবেকের কাছে আমি সনির্বন্ধ আবেদন জানাতে চাই–এ দেশের একজন নাগরিক ও অতি সামান্য শিক্ষক বর্তমানে ভয়ানকভাবে বিপন্ন, সঙ্কটাপন্ন। পরিবার পরিজনসহ পালিয়ে বেড়ানো এই স্কুল শিক্ষকের নিরাপত্তা বিধানে আপনারা কেউ কি এগিয়ে আসবেন না? এলাকায় মধ্যযুগীয় ত্রাস বন্ধে কেউ কি দায় অনুভব করবেন না? ভাইহন্তক, বাস্তুভিটা ধ্বংসকারী বর্বর আততায়ীর একের পর এক নারকীয় কর্মকাণ্ড দেখে যাওয়াই কি আমার নিয়তি? আজ যাঁরা নিজেদের নিরাপদ ভাবছেন, আগামীকাল তাঁরাও যে আমার মতো সঙ্কটাপন্ন হবেন না–সে নিশ্চয়তা কে দিচ্ছে! দুধকলা দিয়ে পোষা সাপের ছোবলে অনেকেরই শেষরক্ষা শেষ পর্যন্ত নাও হতে পারে। সরকার, প্রশাসন ও বিবেকবান দেশবাসী সকলের কাছে আমার আহ্বান–আপনারা কিছু করুন এবং আরও অনেক লাশ বাংলার গাছে গাছে ঝুলে থাকার দৃশ্য দেখার আগেই করুন!'

পত্র লেখক মাহমুদ মুসা ২৬ মে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এসেছেন তাঁদের গোটা পরিবারের অসহায়ত্বের কথা জানাবার জন্য। আমি জানতে চেয়েছিলাম তাঁর নিহত ভাই সত্যি সত্যিই সর্বহারা পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা। মাহমুদ মুসা বললেন, থাকতে পারেন, আমার জানা নেই। আমার প্রশ্ন আমার ভাই যদি কোন অপরাধ করে তার জন্য দেশে একটি সরকার আছে, পুলিশ আছে, আইন আছে, বিচার বিভাগ আছে। বিচারে যদি আমার ভাইয়ের ফাঁসির হুকুম হতো আমাদের বলার কিছু ছিল না। বাংলা ভাই বাংলাদেশের সরকার না আদালত? কোন আইনে সে আমার ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দেয়?

মাহমুদ মুসার কাছে আমি জানতে চেয়েছি বাদশার বিরুদ্ধে থানায় কোন মামলা আছে কিনা। নিহতের অনুজ বললেন, তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় বেশ কিছু মামলা আছে। তিনি দাবি করলেন এর সবই মিথ্যা। উদাহরণ দিতে গিয়ে জানালেন, একটি মামলায় অপরাধ সংগঠনের তারিখ হচ্ছে ৩০/২/২০০০। ফেব্রুয়ারি মাস কিভাবে ৩০ দিনের হয়! আমি জানতে চাইলাম, বাংলা ভাইয়ের 'জাগ্রত মুসলিম জনতা'র ক্যাডাররাই যে বাদশাকে হত্যা করেছে তার কী প্রমাণ আছে? মুসা বললেন, তারা ঘোষণা দিয়েই হত্যা করেছে, দৈনিক পত্রিকাগুলোতে তার বিবরণ বেরিয়েছে। বাংলা ভাইয়ের বাহিনীর দ্বিতীয় অধিনায়ক হেমায়েত হোসেন হিমু, রানীনগর উপজেলার জামায়াতে ইসলামীর আমির মোফাজ্জল হোসেন ও জামায়াতের প্রাক্তন কর্মী আবুল মাস্টারের নেতৃত্বে জাগ্রত মুসলিম জনতার সশস্ত্র বাহিনী বাদশা এবং আরও তিন জনকে তুলে নিয়ে গেছে। বাদশাকে হত্যা করে লাশ গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলেও বাকি তিন জনের লাশ পাওয়া যায়নি। এর পর আমি মুসাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁরা থানায় মামলা করেছেন কী না। না, তাঁরা এখনও মামলা করেননি। বাদশার পরিবার জঙ্গী বাংলা ভাইয়ের দৌরাত্ম্যে বেশ কিছুদিন এলাকাছাড়া। তিনি নিজেও গ্রামে যেতে পারছেন না। তা ছাড়া থানায় বাংলা ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা নেয়া হয় না। বাংলা ভাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় মামলা না নেয়াটা খুবই স্বাভাবিক। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে থানার ওসি যেখানে জঙ্গী মৌলবাদী বাংলা ভাইয়ের দেহরক্ষী হয়ে তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেন, জেলার এসপি, বিভাগের ডিআইজি যেখানে বাংলা ভাইয়ের রক্ষক সেখানে 'বাংলা ভাই'য়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাবে বৃহত্তর রাজশাহীতে এমন বুকের পাটা কারও নেই।

নিহত বাদশার অনুজ একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মাহমুদ মুসা এর পর বললেন কেন জঙ্গী মৌলবাদীরা তাঁদের পরিবারের প্রতি ক্ষিপ্ত। তাঁদের পরিবার রানীনগর এলাকার একটি রাজনীতি সচেতন পরিবার। পারিবারিকভাবে তাঁরা বাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তিনি নিজেও এক সময় ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। বাদশা ও মুসার বাবা আবদুল কাদের তেভাগা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, ইলা মিত্র তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। তাঁদের পিতামহ সাকিম সর্দার ও প্রপিতামহ কাসিম সর্দারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। রানীনগরের পাশেই ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারির এলাকা বিখ্যাত পতিসর। আহমদ রফিকের গবেষণা গ্রন্থে রানীনগরের কাসিম সর্দারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের বিবরণ রয়েছে। তাঁদের বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা হয়। আধুনিক সাহিত্য পাঠের পারিবারিক ঐতিহ্য রয়েছে তাঁদের। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল। পুলিশ তাঁদের বাড়ি তল্লাশি করতে এসে যে সব বই জব্দ করেছে তার ভেতর আরজ আলী মাতুব্বর ও আহমদ ছফার লেখা বইও রয়েছে। মাহমুদ মুসা আরও জানালেন এ বছর পতিসরে বাংলা ভাইয়ের জাগ্রত মুসলিম জনতা বাহিনী রবীন্দ্রজয়ন্তি করতে দেয়নি। তারা বলেছে, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া চলবে না, গাইতে হবে হামদ ও নাত।

মাহমুদ মুসা জানেন না তিনি কবে এলাকায় ফিরে যেতে পারবেন। বাংলা ভাইয়ের জঙ্গী সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে শত শত মানুষ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। বাংলা ভাইয়ের আধ্যাত্মিক গুরু 'জাগ্রত মুসলিম জনতা'র আমির মওলানা আবদুর রহমান আজকের কাগজের প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান সম্রাটের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে স্বীকার করেছেন–'বৃহত্তর রাজশাহী এলাকার সাত উপজেলায় সর্বহারা দমনে তাঁদের এই পদক্ষেপের সঙ্গে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির, ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ও সংসদ সদস্য নাদিম মোস্তফার সমর্থন রয়েছে। রাজশাহীর বাগমারায় যেখানে তাদের কার্যক্রম সবচেয়ে বেশি সেখানে সংসদ সদস্য আবু হেনাও এর বিরোধিতা করছেন না। তারা প্রশাসনিকভাবে সব ধরনের সহায়তা পাচ্ছেন। তিনি বলেন, এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে ৫০ জনকে আটক করা হয়েছে, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে এবং পাঁচ হাজারেরও বেশি সর্বহারা আত্মসমর্পণ করেছে।' (আজকের কাগজ ১৩ মে ২০০৪)। বিএনপির দুই মন্ত্রী, তিন সাংসদ এবং পুলিশ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় বাংলা ভাইয়ের দৌরাত্ম্য এমনই বেড়েছে প্রধানমন্ত্রী চীন যাওয়ার আগে তাকে যে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়ে গেছেন বাংলা ভাই তাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বহাল তবিয়তে এলাকায় বিচরণ করছে। গত ২৩ মে পুলিশের পাহারায় বাংলা ভাইয়ের জঙ্গী বাহিনী রাজশাহী শহরে অস্ত্রের মহড়া দিয়েছে। তারা কয়েক শ' মোটরসাইকেল ও মিনিবাসে চেপে শহরে এসে পুলিশ প্রশাসনকে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। পুলিশের কর্মকর্তারা বাংলা ভাইয়ের তথাকথিত সর্বহারাবিরোধী জেহাদকে অভিনন্দিত করেছেন। (অসমাপ্ত)

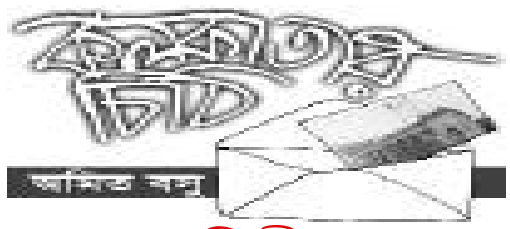

অগ্নিবীণা

অগ্নি সমারোহে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব জ্যৈষ্ঠে। দহন দাহনে নবীনের আহ্বান। কবির বীণাতেও আগুনের স্রোত। বিধ্বস্ত মানবিকতায় বিঁধিয়েছেন বিবেকের কাঁটা। রক্তাক্ত হৃদয়ে সার্থক জীবনের উন্মেষ। শ্রদ্ধাবনত সারা দেশ। বিশেষ অনুষ্ঠান রবীন্দ্র সদনে। গানে কবিতায় ভাষণে নজরুলের উৎস সন্ধান। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নতুন বোধে জাগ্রত। স্বীকার করেছেন, নজরুলের স্বপ্ন ছোঁয়া দুঃসাধ্য। বলেছেন, এমন কোন ইরেজার নেই যা দিয়ে সমাজের সব গ্লানি মুছে ফেলা যায়। চেতনার ভাঙনে বাঁধ দিয়েছিলেন নজরুল। সেটা আরও শক্ত করা জরুরী। কবি কৃষ্ণ ধরের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে এবারের নজরুল স্মৃতি পুরস্কার। ১৯৯৯ থেকে পুরস্কার দেয়া শুরু। এ পর্যন্ত পেয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্পতরু সেনগুপ্ত, অরুণ কুমার বসু, আজহারউদ্দিন খান। সম্মান গ্রহণ করে কৃষ্ণ ধর পুরস্কারের মর্যাদা রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বলেছেন, নজরুল এমন একটা ফুল, যা চিরদিন অম্লান। সুরভিত সর্বক্ষণ।

খাঁটি বন্ধু

বন্ধুত্ব যদি খাঁটি হয় একটিই যথেষ্ট। প্রীতি জিনতার মনটাই আলাদা। কোন লুকোচুরি নেই। স্বচ্ছ নদীর মতো। আপন বেগে বইছে। পাশে পেলেই স্বস্তি। অভিনেত্রী দিব্যা দত্তর হৃদয়ের গভীরে ঢুকেছেন প্রীতি। শূটিংয়ের ফাঁকে মোবাইলে পাখির কুজন। দিব্যার বন্ধুত্বে প্রীতিও সন্তুষ্ট। যুবরাজ ফিল্মসের 'দেশ হো ইয়া পরদেশ' ছবির সেটে দু'জনের আলাপ। পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। শ্যাম বেনেগলের 'নেতাজী' ছবিতে দিব্যার অভিনয় শুরু। ছবিটি মুক্তি পেতে সময় লাগবে। নেতাজীর ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবন মেলানো হয়েছে। বিতর্ক আছে। আপত্তি উঠছে। ভেঙ্গে ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন বেনেগল। দিব্যা কিন্তু বসে নেই। নেতাজী ছবির সুবাদেই ডাক পাচ্ছেন একের পর এক ছবিতে। ছুটতে অসুবিধা নেই। পাশে প্রীতি জিনতার মতো বন্ধু আছে যে।

দেরি নেই

পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং। যাওয়া হয়নি বাংলাদেশ। এবার যাবেন। দু'দেশের বন্ধুত্ব কতটা শক্ত করা যায় ভেবে দেখছেন। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত পরিকল্পনা নেবেন। রূপায়ণে দেরি করবেন না। ১৯৮০-তে পাকিস্তানে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। চীনে কূটনীতিকের দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন। বলেছেন, প্রতিবেশী দেশে মৈত্রীর স্রোত বইয়ে দেবেন। পাকিস্তানের সঙ্গে সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলবেন। বাংলাদেশের বিষয়ে আগ্রহ বেশি। পুরনো ফাইল খুঁটিয়ে দেখছেন। বলেছেন, নদী সংযুক্তি প্রকল্প কতটা কল্পিত, কতটা বাস্তবসম্মত খতিয়ে দেখবেন। কূটনীতিক ছিলেন রাজনীতিক হয়েছেন। পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণে সুবিধা হবে। পরিষ্কার মন্তব্য, বাংলাদেশ কবিতার মতো। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের আহ্বান টলানো যায় না। ইচ্ছে হয় ছুটে যেতে। সময় সুযোগ পেলেই সাধ পূরণ করবেন।

বাঙালী জিন্দাবাদ

সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় লোকসভার স্পীকার হওয়ার পর বাঙালীর জয়ের নেশা জেগেছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অর্জুন সেনগুপ্তকে জাতীয় যোজনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান করার চেষ্টা হচ্ছে। কংগ্রেসের অর্থনীতি বিষয়ক সচিব জয়রাম রমেশের নাম সামনে আছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কাছের মানুষ। কিন্তু বামফ্রন্ট চাইছে অর্জুনকে। ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় অর্জুন নজর কেড়েছিলেন। ১৯৯৬-এ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল, প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেব গৌড়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের অর্থনীতি

বিষয়ক দিক্ষা দলিল তৈরি করেছিলেন অর্জুন। বাম ও কংগ্রেসের মধ্যে অর্থনৈতিক সেতুবন্ধের কাজটা তিনি ভালই পারবেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জির সঙ্গেও গভীর যোগাযোগ। বামফ্রন্ট সরকারীভাবে অর্জুনের নাম প্রস্তাব করলে কংগ্রেস ফেলতে পারবে না। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ অনিবার্য।

সিলেবাসে আছে

ক্রিকেট মাঠ থেকে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে উঠে এলেন শচীন তেন্ডুলকার। ক্লাস সিক্সের দিল্লী বোর্ড অনুমোদিত হিন্দী বই 'ইন্দ্রধনুষ'-এ স্থান পেয়েছে শচীনের সাক্ষাতকার। ক্রিকেটার হয়ে ওঠার কাহিনী। কঠোর অনুশীলন, অদম্য অধ্যবসায়, শিক্ষকের নির্দেশ অনুসরণ করেই শীর্ষে পৌঁছেছেন শচীন। খেলা ও পড়ায় তফাত নেই। দুটোই মন দিয়ে করতে হয়। শিক্ষা দফতরের দাবি, শচীনকে চিনতে গিয়ে নিজেদের চিনতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। ফাঁকি দিয়ে যে বড় হওয়া যায় না বুঝবে। কলকাতার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাথায় কথাটা গেঁথেছে। বাংলা পাঠ্যবইয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষাবিদদের অনেকের ধারণা, ক্রিকেটারের জায়গায় ফুটবলারের কথা এলে ক্ষতি কী। এক সময় বাংলার ফুটবলাররা স্বাধীনতা আন্দোলনকেও ত্বরান্বিত করেছিলেন। অন্য পক্ষ বলছে, অতটা পিছিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। যেটা সামনে আছে সেটাকেই ধরুন। শিক্ষার্থী নির্বিশেষে ক্রিকেটপ্রেমে মাতোয়ারা। সেই প্রেমের জোরেই জ্ঞানের দরজা খোলার চেষ্টা করুন।

সিপিজের বিশেষ রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশে সাংবাদিক দলন

বাংলাদেশের ধোঁয়াশাচ্ছন্ন রাজধানী ঢাকার একটি হাসপাতালে শুয়ে ছিলেন ফিরোজ চৌধুরী। তাঁর ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কেন মামলা করেননি তার ব্যাখ্যায় জানালেন, 'মামলা করা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। ওরা সশস্ত্র। ব্যাপারটা তাই আমার জন্য আরও বিপদের কারণ হতে পারে।' ফিরোজ চৌধুরী প্রথম আলো পত্রিকার আলোকচিত্র শিল্পী। ১৩ বছর ধরে কাজ করছেন এবং রাজনৈতিক বিক্ষোভ, মিছিল প্রভৃতির ছবি তুলে থাকেন। ৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি ছাত্র বিক্ষোভের ছবি তুলতে গিয়ে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের কর্মীদের দ্বারা প্রহৃত হন। তাঁর বুক, পিঠ, কাঁধ ও পায়ে আঘাত করা হয়। চৌধুরী মনে করেন, ১৪ কোটি ৬০ লাখ মানুষের এই দেশটিতে অপরাধ, রাজনীতি আর সন্ত্রাস মিলেমিশে সাংবাদিকতাকে এক বিপজ্জনক পেশায় পরিণত করেছে। রাজনৈতিক কর্মকর্তারা দুর্নীতির খবর ফাঁস করে দিলে তাদের কর্মী আর তল্পিবাহকদের দিয়ে প্রায়ই সাংবাদিকদের নির্যাতন করান। অধিকন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ জাতিকে এবং সাংবাদিকদেরও দ্বিধাবিভক্ত করে তুলেছে। যাতে করে সাংবাদিকতার ঝুঁকিও বেড়ে গেছে। নিজের ওপর এই হামলার পরিণতি নিয়েই ফিরোজ চৌধুরী দুর্ভাবনায়। ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জের দিকটা তাই তাঁর কাছে অস্পষ্ট। তিনি যন্ত্রণাকাতর। মৃদু ভাষায় বর্ণনা করেন, একজন অধ্যাপকের ওপর হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ওপর ছাত্রদলের হামলা কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তাঁর ওপর আক্রমণের আগে তোলা শেষ ছবিতে দেখা যায়, পুলিশ এক তরুণী ছাত্রীকে পিটাচ্ছে এবং ছাত্রদল কর্মীরা বিক্ষোভকারীদের ওপর লাথি চালাচ্ছে।

ওরা যখন তাঁকে ছবি তুলতে দেখে তখনই ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলে এবং মারতে শুরু করে। পুলিশ আর ছাত্রদল নেতারা কাছেই দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা অবলোকন করে। সেদিন আরও কয়েক সাংবাদিক পুলিশ আর ছাত্রদল কর্মীদের দ্বারা প্রহৃত হন। এমন সন্ত্রাসের শিকার হওয়া ফিরোজ চৌধুরীর জন্য নতুন কিছু নয়। গত বছরও তিনি মার খেয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা (সাংবাদিকরা) হামলার লক্ষ্য হয়েই আছি। সরকার হামলাকারীদের আড়াল করে রাখে। ওদের শাস্তি হয় না। ওদের শাস্তি হওয়া দরকার। ওরা যে হামলা করবে পুলিশ তা আগে থেকেই জানত।' এ ঘটনার সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী অবশ্য ভিন্ন কথা বলেন। তাঁর মতে, সাংবাদিকরা নিজেরাই ঝুঁকি নিয়ে মাঠে নামেন। কেননা পুলিশ এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষে সাংবাদিক ও বিক্ষোভকারীদের আলাদাভাবে চেনা সম্ভব নয়। 'পুলিশ তাদের দায়িত্বটাই পালন করে মাত্র'। আলোকচিত্র শিল্পীরা মনে করেন, এ কথাটি ঠিক নয়। ওরা সকলেই বেশ ভালভাবে পরিচিত এবং ক্যামেরা ও অপরাপর সরঞ্জাম তাদের পরিচয় স্পষ্ট করে রাখে। ছাত্রদল কর্মীরা নিজেদের সন্ত্রাসী আচরণের খবর চেপে রাখার জন্যই হামলা চালায়।

নগরীর কেন্দ্রস্থলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় থাকে দেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে। প্রায়ই এখানে সমাবেশ সংঘাত সংগঠিত হয় আর তা পত্র-পত্রিকায় ফলাও প্রচারও পায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও এই বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের রাজনীতিকরা ছাত্র-সমর্থনকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। আর তাই ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দল সকলেরই ছাত্র ও যুব সংগঠন রয়েছে। ছাত্র দলগুলো শিক্ষাঙ্গনে এবং অন্যত্রও সশস্ত্র দুষ্কৃতদের নিয়োগ করে 'পেশীশক্তি' প্রয়োগ করে থাকে। দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী এবং বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ড. কামাল হোসেন মনে করেন, ১৯৮০ সাল থেকে এ ধারার সূচনা এবং সংবাদপত্রের ওপর তা বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ড. কামাল হোসেন বলেন, 'নির্বাচনে কারচুপি করা, নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি, তাবেদারি, চাঁদাবাজি প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যুবকদের সঙ্গে সশস্ত্র দুষ্কৃতদেরও নিয়োগ করা হয়। আর এসব খবর ফাঁস করে দেয় বলেই সাংবাদিকরা এদের প্রধান লক্ষ্য।'

এই লক্ষ্যদের একজন ২৫ বছর বয়েসী হাসান জাহিদ তুষার। সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র তুষার দি ডেইলি স্টারের প্রতিনিধি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ই থাকতেন এবং ছাত্রদলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণবন্ত রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে লেখালেখি করতেন। ২০০৩-এর ৮ মে তুষার একটি খবর লেখেন। যার বিষয় ছিল হুকুম না মানায় একজন ছাত্রকে ছাত্রদল কর্মীদের মারপিট।

খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পরই তুষার ছাত্রাবাসে ছাত্রদল নেতাদের কাছ থেকে হুমকি পেতে থাকেন। বলা হয় তাদের তৎপরতা নিয়ে কিছু না লিখতে। তুষার তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে থাকলে ৩১ জুলাই ২০ ছাত্রদল কর্মী তার কক্ষে হামলা চালায়। কক্ষ তছনছ করে এবং তাঁকে লোহার ডাণ্ডা ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তিন তলা থেকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে এনে ছুড়ে ফেলে। অন্য সতীর্থরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এ হামলা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটালেও হামলাকারীদের শাস্তির জন্য কিছুই করা হয়নি। হামলাকারীদের চারজনকে ছাত্রদল থেকে বহিষ্কার করা হলেও তাদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ই থাকতে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি থেকে বলা হয়, এই হামলার জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস ছাত্রদলের প্রধানই দায়ী। তবু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয় না। তুষার এর পর ছাত্রাবাস ছেড়ে আসেন। তুষার বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময়ই আমাদের সতর্ক থাকতে হয়। সব সময়ই ছাত্রদল ও তাদের সঙ্গীদের ব্যাপারে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়।'

দু'মাস পরই স্থানীয় বিএনপি কর্মীদের হামলায় সাংবাদিক সাইফুল হক মিঠু প্রায় মরতে বসেছিলেন। তাঁর মাথা ও হাতের আঘাত এখনও সারেনি। মিঠু ছিলেন পিরোজপুরে দৈনিক জনকণ্ঠের প্রতিনিধি। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সাংবাদিক নির্যাতন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিক থেকে কুখ্যাত।

একজন সম্পাদক এই এলাকাকে 'মৃত্যুর উপত্যকা' বলে বর্ণনা করেন। গত চার বছরে এখানে মানিক সাহাসহ পাঁচ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

আইনজীবী কামাল হোসেনের মতে, বাংলাদেশের মফস্বল শহরগুলো সংগঠিত অপরাধী চক্রের নিয়ন্ত্রণে। ওদের নিয়ে লেখালেখি করলেই তারা সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। স্থানীয় অপরাধীচক্রগুলো তাদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের সহযোগিতায় দেশজুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে বসেছে। ওরা চাঁদাবাজি করে আর তাদের পৃষ্ঠপোষকরাও অধিকতর সম্পদের জন্য আকুল।

২০০৩-এর ডিসেম্বরে মিঠু পিরোজপুরে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জমিজায়গা দখলের উদ্দেশ্যে একটি সন্ত্রাসী চক্রের অপতৎপরতা ও নির্যাতনের ওপর দু'কিস্তির এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এতে তিনি স্থানীয় বিএনপি নেতৃত্বের সহায়তায় মূল্যবান মাছের পুকুর এবং ৮৫ একর জমি দখল করে নেয়ার বিবরণ তুলে ধরেন। প্রতিবেদনের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই বিএনপি কর্মীরা মিঠুকে অনুসরণ ও হুমকি দেয়া শুরু করে। স্থানীয় সাংসদসহ বিএনপি নেতারা এ খবরটিকে ভিত্তিহীন দাবি করেন এবং তা প্রমাণ করার জন্য একটি কমিশনও গঠন করেন। মিঠু বলেন, এত কিছু করেও ওরা প্রতিবেদনটি অসার বলে প্রমাণ করতে পারেনি। দু'সপ্তাহ পর প্রতিবেদনের দ্বিতীয় কিস্তি বেরুতেই ওরা মরিয়া হয়ে ওঠে এবং পিরোজপুর প্রেসক্লাব থেকে ফেরার পথে মিঠুর ওপর হামলা চালায়। মাথায় রডের বাড়ি মেরে ওরা তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। ডান হাতটি ভেঙ্গে দেয়। তাঁর আর্তনাদে কিছু লোক এগিয়ে এলে মিঠু রক্ষা পান। রাসেল নামে একজন হামলাকারী জনতার হাতে ধরা পড়ে। মিঠু অপর দু'জনকে শনাক্ত করেন। ওরা বিএনপির কামাল ও আকরম আলী মোল্লা। পুলিশ ওদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নিতে পারেনি। কামাল হোসেনের মতে, সাহসী সাংবাদিকরা, বিশেষ করে যারা মফস্বলে কাজ করেন, এসব হামলার প্রধান লক্ষ্য। পুলিশ রাসেলকে গ্রেফতার করে হত্যা চেষ্টার অভিযোগ আনে। কামাল আর মোল্লার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ আনে। তবে ওরা পিরোজপুরে প্রকাশ্যে চলাফেরা করলেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে পারেনি। মিঠু মনে করেন, পারবেও না। কেননা ছাত্রদল, বিএনপি আর জামায়াত নেতারাই পিরোজপুর থানা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পুলিশকে ব্যবহার করে নিজেদের পেশী হিসেবে। মিঠুকে ভারতে গিয়েও চিকিৎসা নিতে হয় এবং এখন তিনি অনেকটা প্রাণের ভয়ে ঢাকায় বসবাস করছেন। কেননা পিরোজপুরে সাত সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। তিনিও তাঁদের একজন।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাস কিন্তু এমন নৈরাজ্যজনক নয়। দি ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের মতে, ঔপনিবেশিক আমলেও এদেশের সংবাদপত্র ছিল সাহসী ও মুক্তকণ্ঠ। পাকিস্তানী আমলেও এদেশের সংবাদ মাধ্যম আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংবাদটি প্রকাশ করেছে। ১৯৯১ সালে দেশের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পরই অবস্থা পাল্টাতে শুরু করে। আনামের মতে, '৯১ নির্বাচনে বিএনপির দুর্বল জয় আওয়ামী লীগকে ক্ষুব্ধ করে। দেখা দেয় দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিভক্তি। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উৎস এতেই নিহিত। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রে উত্তরণ সংবাদ মাধ্যমের বিকাশের ভিত্তি হতে পারত। কিন্তু প্রশাসন তার ব্যর্থতার দায় সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপাতে শুরু করে।' আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলেও সাংবাদিকরা হুমকি আর সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন। ১৯৯৯ সালে জনকণ্ঠ অফিসে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন রেখে দেয়ার ফলে অফিসটি খালি করে দিতে হয়। পত্রিকাটির প্রকাশক মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ বলেন, এই মাইন বিস্ফোরিত হলে গোটা এলাকাই বিধ্বস্ত হতো। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সাংসদ জয়নাল হাজারীর নির্দেশে সাংবাদিক টিপু সুলতান বর্বরভাবে প্রহৃত হন। জনাব মাসুদ বলেন, ঢাকার পত্রপত্রিকায় সরকারের সমালোচনা ও কার্টুনাদি প্রকাশ পেলেও স্বাধীন সংবাদপত্র এখন সরকারের প্রবল চাপে। সমালোচনামূলক লেখার ফলে জনকণ্ঠের সাংবাদিকদের সরকারী অফিসাদিতে ঢুকতে দেয়া হয় না। বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এমনকি তাঁর বাড়ির সামনের একটি দেয়ালও ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। বাংলাদেশের সাংবাদিকরাও এখন দু'দলে বিভক্ত। বিএনপি-আওয়ামী লীগ পথ ধরে সকল স্তরের সাংবাদিক ইউনিয়নও এখন দু'ভাগে বিভক্ত। ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতা গ্রহণের পরই রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা বাসস থেকে ২৭ সাংবাদিককে বরখাস্ত করা হয়। আদালত এই অপসারণ বেআইনী ঘোষণা করলেও তাঁদের ফিরিয়ে নেয়া হয়নি। অপরপক্ষে নতুন করে ৪০ সাংবাদিককে নিযুক্তি দেয়া হয়। চাকরিচ্যুত সাংবাদিকদের একজন হারুন হাবীব, সরকারের এই পদক্ষেপকে 'সম্পূর্ণ বেআইনী চাকরিহরণ এবং প্রচলিত আইনের সরাসরি খেলাপ' বলে বর্ণনা করেন। হাসপাতালে শায়িত আলোকচিত্র শিল্পী ফিরোজ চৌধুরী এখন মানসিকভাবে অস্থির। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বলেন, 'রাজনীতির এ পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। আর আমাকে আবার গিয়ে মাঠে নামতে হবে, কি ঘটছে তা তুলে ধরার জন্য।'

–সান-ফিচার সার্ভিস